শূন্য দশকের কবিতা : নটিজের কণ্ঠে নড়বড়ে নট

খলিল মজিদ

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এরিক হবস্‌বাম বিশ শতককে বলেছিলেন 'শর্ট টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী', যার শুরু হয়েছিল বিলম্বে আর শেষ হয়েছে আগে। তিনি এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯১৪ সালে বিশশতকের চেতনাগত সূচনা এবং ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে এর সমাপ্তি। প্রকৃতই ক্যালেন্ডারের সাল তারিখ ধরে যুগান্তর ঘটে না। ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই সময়ের স্বরূপ চিহ্নিত হয়। কোনো কোনো ভারতীয় মতবাদে যদিও সময়কে ঈশ্বর জ্ঞান করা হয় তবু মহাভারতের সেই ঋষির কথাই প্রণিধান যোগ্য যে, সত্য বলতে অন্য কিছু নয়, ঘটনাই প্রকৃত অর্থে সত্য। ঘটনার স্বাক্ষ্যই বহন করে কাল। তাই ঘটনার প্রতিক্রিয়াই কালের প্রতিচ্ছবি।

পেরেস্ট্রইকার মাধ্যমে ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতনে পূর্ব ইউরোপসহ পৃথিবীব্যাপী শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা আঘাতপ্রাপ্ত হলে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা মঞ্চে আরোহন করে। এক কথায় বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ব শাসনব্যবস্থায় একক কর্তৃত্ব অর্জন করে আমেরিকা এবং গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই মুক্তবাজার অর্থনীতি, স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা, তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষ, পরিবেশ ও জলবায়ু বিপর্যয় এসব নানাবিধ ফেনোমেনায় (phenomenon) একুশ শতকের চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয় বিশ্বসমাজ। আমাদের দেশেও মোবাইল ফোন ও স্যাটেলাইট টিভির সংস্কৃতি নব্বইয়ের দশকেই যাত্রারম্ভ করে। ফলে বিশ্ব এবং পাশাপাশি বাংলাদেশও ক্যালেন্ডারে একুশ শতকের হিসাব শুরুর অনেক আগেই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আঁটগাঁট বেঁধে না হলেও সমাজ ও রাষ্ট্র এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই তৎপরতা সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে কিছু না কিছু প্রতিক্রিযার জন্ম হয়েছে যার ভাষ্য এ সময়ের শিল্প-সাহিত্য-কবিতা-নাটক-চলচ্চিত্রসহ অন্যান্য শিল্পমাধ্যম।

তাহলে বিশ শতকের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বসমাজে ও রাজনীতিতে এবং মানসচৈতন্যে যে রেখাগুলো অংকিত হয়েছে তারই ভাষ্য বিশ শতকের সাহিত্য। মোটা দাগে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকবাদী সাহিত্য। বিশেষ করে বাংলা কবিতায় এই যুদ্ধোত্তর বিমর্ষ আধুনিকতার চর্চা সুস্পষ্টভাবে শুরু হয় তিরিশের দশকে। এজন্য বিশ শতকের বাংলা কবিতার প্রধান পরিচয় বলতে হবে তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা।

এই 'তিরিশোত্তর'-এর পরে এসেছে 'আধুনিকোত্তর' যা উত্তর-আধুনিক অভিধায় আলোচিত হচ্ছে। অর্থাৎ তিরিশোত্তর বাংলা কবিতাই আধুনিকবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যদিও বাংলা

কবিতার আধুনিক যুগের সুচনা হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের পয়ার-ভাঙা অমিত্রাক্ষরের বিন্যাসের মাধ্যমে, কিন্তু প্রকৃত আধুনিকবাদী মনন ও চিন্তাপ্রবাহের দেখা মেলে পরবর্তী শতাব্দীর তিরিশের দশকে; বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখের কবিতায়। এবং এই কাব্যচেতনা যা তিরিশোত্তর কবিতা হিসেবে গণ্য তার ধারাবাহিকতা বহন করেই বিশ শতকের বাংলা কবিতা একুশ শতকের মোহনায় এসে মিশেছে। আর সেই যুগসঙ্গম সূচিত হয়েছে ক্যালেন্ডারে একুশ শতকের নামলিপি মুদ্রণের এক দশক পূর্বেই, অর্থাৎ বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে। তাই বাংলা কবিতা তথা বাংলাদেশের কবিতার শূন্যের দশকের আলোচনা করতে গেলে নব্বইয়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য ও গতিবিধি লক্ষ রেখেই করতে হবে।

সময়ের তরঙ্গে বাঁকবদলের নিরীক্ষার মধ্যেই নব্বইয়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য নিহিত। বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের দোলায় দোদূল্যমান বাঙালির মানসচেতনায় দ্রুত পরিবর্তন চিহ্নিত হতে থাকে এ সময়। বাংলাদেশের কবিতার ভাববলয়ে এবং শিল্প-সংগঠনে নতুন এক হাওয়ার বেগ সঞ্চারিত হয়। শিল্প নির্মাণের নয়া ডিসকোর্সে প্রভাবিত হতে থাকে বাংলা ভাষার কবিতা; তার জন্য নতুন চিন্তা-কল্পনা এবং বাক্যের নয়া বিন্যস্ততা চিহ্নিত হতে থাকে। ঐতিহ্যের পুনঃনির্মাণের সচেতন চর্চা এর আগে এত বড় আয়োজনে আর দেখা যায়নি।

নব্বইয়ের কবিতা নিয়ে পত্রিকান্তরে লিখেছিলাম যে, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কবিতায় যে বিষয়টি সাধারণ ও বিশেষ– উভয় অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তা হল ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণের অনন্য প্রেরণা। বাংলাকে বাঙালির স্বভাবজ চারিত্র্যে ও ভঙ্গিতে প্রকাশের এমন সম্মিলিত আয়োজন বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিরল। কবিতাকে বাংলার নিজস্ব শক্তিতে ও ব্যঞ্জনায় অনুভব করার সচেতন একটা প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক কবিতার প্রধান চারিত্র্য হিসেবে লক্ষ্যণীয়। কবিতার ভাবে ও ভাষায় নিবিড় প্রাচ্যবোধ সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কবিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কবিতার মর্মে ও অস্থিতে ইতিহাস চেতনা ও কালজ্ঞান থাকার জীবনানন্দীয় ব্যাখ্যা এ প্রজন্মের কবিদের আত্মস্থ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

শব্দ নিয়েই কবিতা, তবে সে শব্দের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রভা' থাকতে হয়। শব্দের সমাজতত্ত্ব ও শব্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এ সময়ের কবিতার আবহে আকৃত হয়েছে। সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠছে শব্দের ঔপনিবেশিক ব্যঞ্জনা ও শব্দের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের বোধ।

বাংলার প্রাচীন ভাষা, সংস্কৃত, এমনকি আদিবাসীদের শব্দাবলী ও অনুষঙ্গ, আঞ্চলিক বিবিধ শব্দ ও বিষয়-প্রসঙ্গ, প্রত্নস্মৃতি, লোককথা, মিথ, লোকধর্ম, শাস্ত্রাচার, মন্ত্রযোগ, তন্ত্র, আধ্যাত্মিকতা, লোকদর্শন, অধিবিদ্যা এ সময়ের কবিতায় শুধু অনুসঙ্গ হিসেবেই আসছে না, ভাষা ও প্রকরণের নতুন বিন্যাসের সন্ধানে একেবারে দেশীয় লোক-ফর্ম নিয়েও নিরীক্ষা হয়েছে।

বাচনের বহুরৈখিক বিস্তার, বিচিত্র প্রেক্ষাপটের চিহ্নায়ক এবং সময় ও পরিসরের সমস্ত জটিলতাকে ঐতিহ্যের আবহে স্থাপন করে নতুন কবিতার এই উর্বর ভূমি কর্ষিত হচ্ছে। যোগ হচ্ছে নতুন বাক-বিন্যাস। বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিশ্বের সাম্প্রতিক চিন্তনের আলো ও সংকেত এসে পড়ছে কবিতায়। বাক্যবোধ, সময়চেতনা, অলঙ্কার ও অন্ত্যমিল কবিতার চিরবৈশিষ্ট্য বলে মান্য এই সব বিষয়ে নব্বইয়ের দশকের তরুণ কবিদের আগ্রহ আছে। বাংলার নিজস্ব রীতি ও ব্যাঞ্জনার স্বাভাবিক ছন্দবোধ তরুণদের অনেকের কবিতায় বেজে ওঠছে যা ভবিষ্যতের বাংলা কবিতার জন্য বিস্তৃত পাটাতন হতে পারে।

ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভার সম্পর্ক নিয়ে কবি টি এস এলিয়ট-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়, 'ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না, এবং কঠোর শ্রমের মাধ্যমেই তা লাভ করতে হবে। ঐতিহ্য অর্জনে প্রথমেই প্রয়োজন ইতিহাস-চেতনার যাকে আমরা প্রায় অত্যাবশ্যক বলে মনে করতে পারি অন্তত তাঁর জন্য যিনি তাঁর বয়সের পঞ্চবিংশতি বছর পেরিয়েও কবি নামধেয় থাকতে ইচ্ছুক। আর সেই ইতিহাস-চেতনার জন্য দরকার একধরনের বোধের যে বোধ হবে যুগপৎ অতীতের অতীত চেতনা এবং অতীতের সমকালীন চেতনার।'

এবং কবি অক্তাভিয়ো পাজ-এর মতে, 'আমরা সময়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি; বিপ্লব বলা যাবে না একে, কিন্তু শব্দটির টেকসই ও গভীরতম অর্থে বলা যায় বিদ্রোহ– কেবল উৎসে ফেরা, প্রারম্ভে প্রত্যাবর্তন। আমরা ইতিহাসের যবনিকা প্রত্যক্ষ করছি না, ... বরং এ হলো পুনরারম্ভ। হারানো বাস্তবতার পুনর্জন্ম, যা অবদমিত ও যা বিস্মৃতির অতলগর্ভে, তার পুনরাবির্ভাব– যা চালিত করতে পারে পুনর্জীবনে– যেমনটি, ইতিহাস সাক্ষী, অন্যকালেও ঘটেছে। উৎসে প্রত্যাবর্তন প্রায় সর্বদা মনে হয় বিদ্রোহ : নবায়ন, রেনেসাঁস। ... কিন্তু কাব্য এমন এক কর্মকাণ্ড যা কোন প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত বলে না'। (Tradition and Individual Talent by T S Eliot, Poetry and Open Market by Octavio Paz; বাংলায় অনুবাদ- দাউদ আল হাফিজ)।

বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের কবিতাকে ঐ দশকেরই উল্লেখযোগ্য একজন কবি তুষার গায়েন এভাবে সনাক্ত করতে চেয়েছেন যে– 'নব্বইয়ের কবিতা হচ্ছে সেই প্রজাপতি যে গুটিকা থেকে বের হয়ে এসেছে রৌদ্র আর বাতাসের তুমুল সংঘর্ষে, অতল পাখনায় যার বহুবর্ণের সমাহার; জল ও মাটি থেকে নাকে ভেসে আসে বহুকালের পলি ও বেদনার গন্ধ আরো বহুদূর কালে প্রসারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষায় এখন শান্ত গর্জনে আরাধনাশীল। অনেকানেক কাল ও অস্তিত্বকে ধারণ করবে যে কবিতা তাকে পাল্টে যেতে হবে নিশ্চয়ই। তাই নতুন ভাষা ও আঙ্গিক সন্ধান, শব্দ ও প্রকরণ নিরীক্ষা। ব্যক্তি ও যৌথ মননের আশ্রয়ে বহুবর্ণ মানুষের জীবন ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার অনুসরণ, অবচেতনার স্তর থেকে উৎসারিত স্বপ্ন ও দর্শনের বিস্ময়, সচল আধ্যাত্মিকতা, দেশ-কাল-সত্তা সম্পর্কিত অনুধ্যানকে বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার যুগপৎ সন্ধিতে স্থাপন, সর্বোপরি প্রাচ্যকে প্রাচ্যের চোখে দেখার প্রজ্ঞা ও স্পর্ধার কথাই বিবেচিত হচ্ছে যা একদিন স্বাভাবিক গতিতেই পৌঁছাবে আন্তর্জাতিকতায়।'

নব্বইয়ের কবিতার প্রবণতা সনাক্ত করতে গিয়ে কবি-প্রাবন্ধিক চঞ্চল আশরাফ চিহ্নিত করেছেন– তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশ, বিমূর্তায়ন, গদ্যভঙ্গি, নৃতাত্ত্বিক অনুসঙ্গের ব্যবহার, কোলাজরীতি, লোকজ উপাদানের প্রয়োগ, স্যাটায়ার, আবেগের চেয়ে বুদ্ধির সরল প্রাধান্য, বিবৃতিধর্মিতা বর্জনের চেষ্টা, চিত্রাত্মকতা, আখ্যানরূপকের ব্যবহার, ছন্দমনস্কতা, ইত্যাদি।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, নব্বইয়ের কবিতার এই নানামুখী নিরীক্ষার বিপুল বিস্তার ও পরিণতি প্রাপ্তির কথা ছিলো যে শূন্যের দশকের কবিতায় তা একেবারেই ঘটেনি। নব্বইয়ের কাব্যরীতি গৃহীত হয়নি শূন্যের দশকে, অনেকাংশে, বলা যায়। শূন্যের কবিতায় ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতার তেমন প্রামাণ্য কিছু নেই। যা আছে তা হলো ক্ষণিক উপলব্ধি ও সংবেদনের রূপকল্প নির্মাণের কুশলতা, ব্যাঞ্জনাময় পদবিন্যাসের সচেষ্টতা এবং শব্দের নতুন নতুন সমাসবদ্ধতা। তবে নতুন কাব্যভাষা নির্মাণের দুর্দমনীয় সাহস লক্ষ করা যায় এ দশকের কবিতায়। কিন্তু এ সাহস অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সিদ্ধ কোনো কার্যকরী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা রাখে না। এ

সাহস অর্বাচীনের, অপ্রাপ্ত বয়সের আবেগের মত দিকভ্রান্ত। চমকে দেয়ার চেষ্টা যতটা চোখে পড়ে, নতুন কাব্যভাষা অনুসন্ধানের প্রতি নিষ্ঠা ততটা দেখা যায় না। বিশ্ববাজার, অর্থাৎ কিনা ইলেক্ট্রনিক চ্যানেল ও প্রচারণা কারো কারো মনোযোগে বাধ সেধেছে; আবার কেউ কেউ প্রিয় কবির কাব্যভাষার অনুকরণে নিজের মহামূল্য মেধার অপচয় করেছেন। এরই মধ্যে অনেকেই তাদের সচেষ্টতা দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন– পলাশ দত্ত, জাহানারা পারভীন, তুষার কবির, পিয়াস মজিদ, রিসি দলাই, মাহমুদ শাওন, অভিজিৎ দাস, বিল্লাল মেহদী, সঞ্চয় প্রথম, আরণ্যক টিটো, সঞ্জীব পুরোহিত, শুভাশিস সিনহা, রুদ্র আরিফ, জুয়েল মোস্তাফিজ, সিদ্ধার্থ শংকর ধর, আহমেদ ফিরোজ, নীতুপূর্ণা, সোহেল হাসান গালিব, তুহিন দাস, লুবনা চর্যা, মুক্তি মন্ডল, জাহিদ সোহাগ, মামুন খান, আফরোজা সোমা, সৈয়দ আফসার, ফেরদৌস মাহমুদ, প্রমুখ।

লোক সম্পাদক অনিকেত শামীমের প্রচেষ্টায় এবং তাড়নায় (বিঃ)তাড়িত হয়ে শূন্যের দশকের কয়েকটি কবিতার বই নিয়ে পাঠ-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হলো। বইগুলো হলো– মায়াহরিণ (রিসি দলাই), আততায়ীর চোখ (মাহমুদ শাওন), সার্কাস তাবুঁর গান (বিজয় আহমেদ), জল ও জলপাই (মামুন খান), জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয় (জুয়েল মোস্তাফিজ), নিগ্রো পরীর হাতে কামরাঙা কেমন সবুজ (অভিজিৎ দাস) ও আলোকাটা লেন (নাভিল মানদার)।

মায়াহরিণ : নয় সোনার হরিণ

'বাক্যকে উল্টে দিলেই কাব্য' এ আপ্তবাক্য পদ্যের, কবিতার নয়। পদ-এ যদি লেখা হয় পদ্য আর গৎ-এ গদ্য; কবিতা তবে লেখা হয় কিসে? কবিতা (কবি + তা) কি 'কবি' ভাষায় লেখা হয়? কবি-ভাষাটাই বা কেমন? এমন নানা জিজ্ঞাসা কবিতার পাঠক-লেখকদের মনে জাগে। কিন্তু এর উত্তর প্রায়শঃই থেকে যায় অধরা। যেন সে মায়াহরিণ।

তবে রিসি দলাই-এর মায়াহরিণ প্রচল চালের, অধরা নয় একেবারে। ভাষাটা গদ্য অন্বয়ের, ভাবনাটা কাব্যিক। এহ্ ত আধুনিক।

> 'চমৎকার অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। জীবন এমনই সুদৃশ্য পণ্য মোড়কে আবৃত রসায়ন; ক্ষণিক মুখাবয়ব দৃশ্যপটে ভেসে আসে। এতগুলো মুখ তারপর দেখো তোমাকে কেমন চেনায়, অচেনা লাগে অবচেতন মন ফেরারি ভালোলাগায়' । (ছায়াঃ মায়াহরিণ)

'কবিতা ও মুক্তবাজার' প্রবন্ধে অকতাভিয়ো পাজ বলেছেন, 'আজ সাহিত্য ও শিল্প পড়েছে আরেক ভিন্ন বিপদে; কোনো আদর্শ কিংবা কোনো পার্টি নয় বরং হুমকি দিচ্ছে এক মুখাবয়বহীন, আত্মরহিত, দিকচিহ্নহীন আর্থনীতিক প্রক্রিয়া। বড়ই সর্পিল, নৈর্ব্যক্তিক, পক্ষপাতহীন, অনমনীয় এই বাজার। ... এই অন্ধ ও বধির বাজারটি কোনক্রমেই সাহিত্য কিংবা ঝুঁকির ভক্ত নয়; এবং বাছাই করা কাকে বলে সে জানে না। তার সেন্সরশিপ কোন আদর্শিক ব্যাপার নয়, কেননা 'আইডিয়া' কাকে বলে সে জানে না। সে জানে শুধু দরদাম, কিন্তু মূল্যের বুঝে না কিছুই।'

> 'শিশু-মমত্বে মাল্টি-কোম্পানী আঙিনা - আয় আয় আয়
> দানো হয় ক্রমে; আর
> দুধ তেষ্টায় উজ্জীবিত হলে টিভি সিরিয়াল অষ্টাদশী ষোড়শি-স্তন
> রাশি রাশি দুগ্ধ-ফেনা বমন করে অবিরাম'।
>
> (মনসান্টেপর্ব-২)

বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার এর অগ্রযাত্রায় যাবতীয় জাতীয় সম্পদ, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য উপচার সমেত মায় মায়ের বুকের দুধ পর্যন্ত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া এই একক বাজার কর্তৃত্বের কালে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে যে দেওলিয়াপনা বিস্তৃত হচ্ছে, পণ্যের এই পাপাচারকে উপলব্ধি করেছেন রিসি দলাই।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট আর স্যাটেলাইট টিভির সম্প্রচারে-সম্প্রসারে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে গোলকায়নের পথে, বিলুপ্ত হচ্ছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কার ও রূপকথা; এমনকি ধর্মও। তার পাশে প্রযুক্তির রিপ্রোডাক্ট হিসেবে দেখা দিচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয়। এসবই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের লেবাসে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, নিয়োজিত বুদ্ধিজীবী, সহায়ক সংবাদ-মাধ্যমের বহুমুখী কর্মচাঞ্চল্যে মানুষ যে দিকে এগুচ্ছে তাকে সত্যি মায়াহরিণের পিছে নির্বোধের ছুটে চলা বলেই মনে হয়।

তবুও, 'পুঁজিবাদ কবিতাকে জয় করতে ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়। নইলে কবিতা নিয়ে মার্কেট ইকোনমির একটা চেপ্টার সংযুক্ত হতো। বাজারের ভাঁজে ভাঁজে ফাঁদ, প্রলোভন।' ভালো-মন্দ বোধ গিলে খেয়ে সবকিছুকে প্রয়োজনীয় পণ্যে রূপান্তর তক তার খেমতি নেই। মায়ের স্তনকেও কৌটায় করে বাজারে তুলে ছেড়েছে। কবিতা চিন্তা ও হৃদয়ের সহবাস, জাগৃতি। আর পুঁজিবাদ নিরেট হৃদয়হীন। কেনা বেচার বাইরে কোন কিছুর অন্য মূল্য থাকতে পারে বাজার তার কোন সংজ্ঞা জানে না। তবু আমাদের 'বর্তমান' বাজারের হুল্লোরে হাঁপাচ্ছে।

রিসি দলাই এই সংকটকে অনুধাবন করেছেন। এ সময়ের একজন তরুণ কবি ভাষা বিন্যাসে ও কাব্য চেতনায় যথেষ্ট ঋদ্ধ না হলেও সমকালের এই ধারণাপুঞ্জকে কবিতায় সনাক্ত করণের মাধ্যমে রিসি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

> 'একটি কাঁচজার আমার অস্তিত্বে, একটি ধ্বংস আমার অস্তিত্বে
> অতঃপর মেড ইন আমেরিকা
> বুকে চলমান বিজ্ঞাপন
> বিশ্বায়ন, হংকং-প্যাকিং মানুষের সত্তায়।'
> (-অথবা চাঁদ- অথবা সময়- পেটেন্ট-মন্ত্র; অথবা কর্পোরাল বিশ্বায়ন)

বিশ্বময় বাজারে মানুষেরা সবাই যেন ফেরিওয়ালা, শুধুই কেনা বেচার হাটে মানুষ তার মেধা বিক্রি করছে, বিক্রি করছে ঘুম ও ভবিষ্যত। আর ইথার ওয়েবের আন্তরজালের ফাঁদে সবাই যেন একেকজন ফেরারি।

> 'হারিয়ে ফেলেছি নিজেকেও, খুঁজি না চিহ্নেশ্বরী চিহ্ন কপালে, কপালের লালে। ঘামনুন ছড়িয়ে পড়ে, অবসর মেলে না পাবার। .... চিরভীরু মধ্যবিত্ত জমে যায়, শুধই জমে যায় নেশার মদে; নিজেকে নিঃশেষ করে দাঁড়িয়ে থাকা।'

বাক্যকে মুচড়ে দিয়ে কবিতা করার চলতি এবং লোভনীয় পথে হাটেননি রিসি। সচেতনভাবে। এবং বোধ করি পরিকল্পিতভাবেও। ভাষায় ও বিষয়ে সচেতন পরিকল্পনার চিহ্ন যে কোন তরুণ কবির সক্ষমতার পরিচয় বহন করে। অর্জিত অভিজ্ঞতার ব্যাঞ্জনাময় ভাষা-প্রকাশই সাধারণ অর্থে কবিতা। আর এই সাধারণ অর্থের বাইরের অন্য অন্য (একই সাথে অনন্য) অর্থের আবিস্কারই নূতন কবিতা। তারুণ্যের কবিতা।

জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়, যেমন নয় কবিতার আসরেও

যদিও বাক্য বিন্যাসে গদ্য অন্বয়ের আশ্রয় নিয়েছেন জুয়েল, তবু তার কবিতারও প্রধান আশ্রয় রণজিৎ দাশ।

> মাটির ভেতর মাটিরা কি আরামে আছে! গাছের ভেতর একটা অদ্ভূত ফোঁকর থাকলেও আমরা দুঃখেই থাকি। আমাদের মাথার ভেতর হঠাৎ উদ্ভাবিত মৃত্যু। আমরা দৌড়াতে পারি না, কারণ আমাদের পা টুপি পরে থাকে। যাত্রার কিংবা সার্কাসের স্টেজের কাছে আমাদের মানায় ভালো, কিন্তু যাত্রা কিংবা সার্কাসের স্টেজের বাঁশ খুটি আমাদের মানিয়ে নিতে পারে না।
>
> *(জুয়ার আসরে কোনো আঙুলই মিথ্যা নয়: দুই)*

মনোলগ ও মন্তব্য আর পরিহাস ও প্রতিচিত্র তার কবিতা নির্মাণের প্রধান চিহ্নায়ক। উল্লেখ করা দরকার যে বইটি উৎসর্গ করেছেন নব্বইয়ের দশকের কবি শামীম রেজাকে। কবিতা নির্মাণেও তাঁকে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়।

> '– যারা সারারাত ঘুমাবে না বলে কৈবর্ত পাড়ায় যৌনচক্রে
> পড়েছে, কেবল তাদের তালগাছের মতো ঘুম, আমরা বাকিতে কিনি।'
>
> (পূর্বোক্ত: এক)

অথবা,

> '.... মৃত্যুর জন্য কতবেল গাছই আদর্শ গাছ; সরাই শ্রমিকের এপিটাফে লেখা ছিল বলে আমরা পড়তে পেরেছিলাম। কতবেল গাছ স্বপ্নের ভেতর বড় হয়, ঘুমের ভেতর বড় হয়, বেশ্যার শাড়িতে বড় হয়। কতবেল গাছের ডালে মৃত্যুর আহ্বান আছে একটু ভেবে নিলে ভালোভাবে বোঝা যাবে সরাইখানার মাঠে অনেক কতবেল গড়াগড়ি করে।
>
> (পূর্বোক্ত: পাঁচ)

এই যে যৌনচক্র আর কৈবর্ত পাড়া, কতবেল গাছ, মৃত্যু আর সরাইখানা– এদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টার নাম যদি কবিতা হয়, তবে এ কবিতার মৃত্যুর জন্য কোনো কঠিন কত্‌বেল গাছের ছায়া খুঁজতে হবে না, খোলা মাঠই যথেষ্ট। অর্থাৎ ভাবনা কল্পনায় যুক্তি-শৃঙ্খলার যে রসায়নে রূপকল্পের একটি যৌগ নির্মিত হয়, সে যুক্তি পরম্পরা ও সে রসায়ন জুয়েল মোস্তাফিজ কতটা সম্পন্ন করতে পেরেছেন তা ভেবে দেখার বিষয়।

কবিতাগুলো টানা গদ্যের, কিন্তু কথাগুলো বাঁকা ব্যাঞ্জনার, কবিতার মতো; বিমূর্ত, চিত্রকল্প, ইম্প্রেশনিস্ট, স্বপ্ন-কুহক। ভাবনাপ্রবাহের যে মাত্রায় এবং ভাষাবিন্যাসের যে স্পন্দনে একটি বক্তব্য কবিতা হয়ে ওঠে এবং পাঠক সংবেদনে দূরান্বয়ী অনুরণন তোলে তা হয়তো অধরাই থেকে গেলো জুয়ার আসরের তাসের কার্ড বিন্যাসের আঙুলের কারুকাজে।

> '.....সমস্ত আলো দাঁড়িয়ে গ্যালো তুলা গাছের বিরুদ্ধে। এই মাথা; যার ভেতর সহস্র বছরের করুণা। এই মাথাটা বিক্রি করে দেব বলে পিছু নিয়েছি এক মাথাওয়ালার। মাথাওয়ালার বাম হাতে আছে শাসকের ঘড়ি,
> ডান হাতে অন্ধকারের চাতাল, ...'
>
> (পূর্বোক্ত: আটচল্লিশ)

কিন্তু জুয়েল মোস্তাফিজ নতুন কবিতা নির্মাণের প্রশ্নে বেশ সাহসী। ভাল কবিতা লেখার লোকপ্রিয়তার পরিধি পেরিয়ে একজন তরুণ কবির নতুন কাব্যভাষা আবিস্কারের ঝুঁকি নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয়। জুয়েল মোস্তাফিজ পরিকল্পিতভাবে নিজের একটি কাব্যজগৎ নির্মাণের সাহস দেখিয়েছেন, এর জন্য সাধুবাদ তার প্রাপ্য।

সংখ্যায় চিহ্নিত পঞ্চাশটি কবিতা মূলত একটি জীবনবোধের বিস্তরণ। সমসাময়িক মধ্যবিত্তের জীবন ও সংকট চিহ্নিত হয়েছে নানা বিভঙ্গে; তার সাথে ব্যক্তির অতৃপ্তি, স্বপ্ন ও বিকৃতি। সমকালীন রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অসহায়ত্ব ও আত্মবিক্রয়ের হাট-বাজারের দৃশ্যও বিভিন্ন রূপকে উঠে এসেছে তার কবিতায়।

আততায়ীর চোখে ব্যক্তি উন্মোচনের লেসার রশ্মি

'শূন্যে ছুড়েছি সম্ভাবনার মুদ্রা
নেমে এলো দুরন্ত সার্কাস বালক
.....মুদ্রার একপিঠে সন্দেহ রেখে ফিরি, রহস্য অন্য পিঠে'
(মুদ্রা রহস্য)

তার নিজের জবানীতেই শনাক্ত করা যাক মাহমুদ শাওনের কবিতার সম্ভাবনা ও রহস্য। আততায়ীর চোখই বটে তার। নিজের বর্তমানকে হনন করার এক তীব্র লেসার রশ্মি যেন তার চোখে। তার কবিত্বই যেন ব্যক্তিসত্তার আততায়ীর রূপ নিয়েছে। 'আপন ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে বহুদিন যুগলবন্দনায় জেনেছি, ছায়াবেশে সে এক ক্ষুব্ধ আততায়ী'।

'বাষ্প উত্থাপিত জলে কিছু কথা থাকে
আত্মীয় কিছু শোক
সে কথা জানে না ভূগোল শিক্ষার্থী
অভিজ্ঞ সুর্যালোক'..

(জল ও পথ-বাষ্পের গুচ্ছ অনুলিপি: ৪)

বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক কালের পাঠকের কাছে এ ভাষা নতুন কোনো ব্যঞ্জনা তৈরি করে কি? একজন তরুণ কবির এমন আত্মসমর্পণ শূন্য দশকের বাংলাদেশের কবিতার একটি প্রবণতা হিসেবে সনাক্ত করা যায়। বাক সংযম, নতুন মেটাফর, আর চমকের ঝলক মাহমুদ শাওনের কবিতার বৈশিষ্ট্য। এবং বলা যায়, নব্বই পরবর্তী এই শূন্যের দশকে বাংলাদেশের তরুণ কবিদের কাব্য-নির্মাণ-কৌশলের প্রধান চর্চিত ধারা এটি। এ পথে সম্ভাবনার মুদ্রা ক্রমশ মুদ্রাস্ফীতিতে দাম হারিয়ে ফেলার আশংকা থেকে যায়।

'পাথরকে দিয়ে মৃদু টোকা, কিছু ঘর্ষণ, পেয়েছি এই ছাইচাপা আগুন
আগুনকে দিয়ে কিছু কাঠ, শুকনো খড়, পেয়েছি বনপোড়া ছাই।'
(প্রশ্রয়)

প্রকৃতই ভাবনাকে মৃদু টোকা দিয়ে কল্পনার আগুনে কিছু অভিজ্ঞতার কাঠ সরবরাহ করে মৃদু আঁচের ব্যাঞ্জনার যে ছাইচাপা আগুন জ্বলে ওঠে তা খুব একটা স্থায়ী সম্ভাবনা জাগায় না। বরং 'ছায়া ঠোঁটে উড়ে যায় দিন, রঙিন/ বনে বনে উধাও বন ও হরিণ।'

মাহমুদ শাওন কবি। কবি এজন্য যে, চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে সমকালীন কাব্যভঙ্গিতে নতুন মেটাফরে গাঁথতে পারেন তিনি। তাঁর কবিতা মেদহীন, ঝরঝরে; কিন্তু বড় পলকা, শেকড়শূন্য, ঐতিহ্যবিমুখ। তার সতীর্থ অধিকাংশ তরুণের কবিতাই স্কেচধর্মী। বড় কোনো প্রেক্ষাপটের উপর তারা রেখাপাত করেন না, সাদা কাগজে পেনসিলের স্কেচ দিয়ে ফুঁটিয়ে তুলেন কল্পনার প্রতিশিল্প।

সার্কাস তাঁবুর গানে জিপসীদের সুর

রণজিৎ দাশ-এর ভাষার ছকে নিজের রূপকল্প বিন্যস্ত করে কবিতা লেখেন বিজয় আহমেদ। যেমন– 'বাস স্টপেজে এক ভিখেরিকে/গান গাইতে শুনেছি সকালবেলায়। সেই থেকে মন খারাপ।' বিষয়টি বেশ মজার। পড়ার মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বিজয় কি পরাজিত হতে হতে উঠে দাঁড়ানোর ভাষা খুঁজে পাবেন? তেমন প্রতিশ্রুতি আছে তার সার্কাস তাঁবুর গানে। এমন সুক্ষ্ম যার অনুকরণ, দুর্দান্ত সব মেটাফর যার, তার কাছে আরো কিছু আশা করা যায়।

'দুপুরে, শরীর যখন খুব সন্ত্রাসী
তখন সার্কাস-বালিকার ইচ্ছে হয়
বাঘের কানে গান শুনিয়ে আসতে,
সেই গান, যা শোনামাত্রই পৃথিবী জুড়ে নেমে আসবে
বিষাদ- শতি ও বরফ;
(সার্কাস-বালিকা)

আগেই বলা হয়েছে নব্বইয়ের দশকের কবিতায় ঐতিহ্য পুনঃনির্মাণের যে সচেষ্টতা লক্ষ করা গেছে শূন্য দশকের কবিতায় তা প্রায় নেই। বিজয় আহমেদের ভাবনাবলয়েও যথারীতি বাঙালির চিরকালীন আখ্যানরূপক বা লোকজ অনুসঙ্গের সমকালীন বিনির্মাণ, ভাষার ঐতিহ্য থেকে ছন্দ নিয়ে নিরীক্ষা– এসবের কোন পরিচয় নেই। আছে স্যাটায়ারের তির্যকতা, সাময়িক অভিজ্ঞতার ও উপলব্ধির ব্যাঞ্জনাময় মেটাফরিক প্রকাশ; আছে প্রতিচিত্রের কোলাজ। উন্মুলতা কীভাবে একটি দশকের প্রায় সকল কবিতাকর্মীকে পেয়ে বসতে পারে বাংলাদেশের শূন্য দশকের কবিতা বোধ করি তার বড় এক দৃষ্টান্ত। নিতান্ত দু'য়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া এ দশকের অনেক লিখিয়ের অধিকাংশের কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই, ভাব ও ভাষার ক্লাসিক সমন্বয় নেই, নেই চিরকালীন সংবেদনের ব্যাঞ্জনাবোধ। হিন্দী ছবির জনপ্রিয় গানের তরলতা ও মজাদারিত্ব তাদের যেমন আকর্ষণ করে ধ্রুপদী সংগীতের সাধনা ও বহুমাত্রিকতা তেমনটা করে না।

পাঠক আশা করবে বিজয় আহমেদ বাঙালির ভাষা ও ঐতিহ্যে আরো মনোযোগ দেবেন, নিজের কবিতার জন্যে নতুন শব্দ বিন্যাসের ক্ষেত্র খুঁজে নিতে নিষ্ঠাবান হবেন। তার কবিতার কিছু উদ্ধৃতি

'আর ভাবতাম বড় হয়ে যখন আমি
লাল রঙের টাইমফেল রেলগাড়ি হবো
তখন ওদের পাত্তাই দেবো না'
(আমার কবিতা)

'সার্কাসের অতিকায় তাঁবু দেখে আমার ভিতরে
বিষাদ জেগে ওঠে;
মনে হয়, এই বুঝি অখন্ড ভারতবর্ষ,

যেখানে একদল কাকতাড়ুয়ার সাথে
একটা পা-খোঁড়া বাঘ ও বামনের সম্পর্ক;

(সার্কাস-তাঁবুর গান)

জল ও জলপাই : টক ঝাল মিস্টি

সিঙ্গেল মেটাফরের কবি মামুন খান। তার স্বর হ্রস্ব, চাল দ্রুত। দেখেন অনেকদূর পর্যন্ত, কিন্তু বলেন ছোট্ট করে। পরিহাসপ্রবণ দৃষ্টিতে তাকান চারপাশে আর কুড়িয়ে নেন টক-ঝাল-মিস্টি স্বাদের কিছু মেটাফর। মচমচে এবং মজাদার। তাতে জিহ্বার স্বাদ কিছু মিটে বটে, কিন্তু পেট ভরে না। এমনি টাটকা কিছু বাকপ্রতিমা সাজানো আছে তাঁর প্রথম কবিতার সংকলন 'জল ও জলপাই'-এ।

'ভারতবর্ষের সবক'টি দেশ ও প্রদেশের
হামলে পড়া তুফান হাওয়ায়
একলা নেচে যাচ্ছেন একরত্তি ঐশ্বরিয়া'

(জল ও জলপাই: ০৪)

তাঁর সমসাময়িক অন্য দুই কবি রুদ্র আরিফ ও বিজয় আহমেদ বইয়ের ফ্ল্যাপে বলেছেন, 'শব্দের সাথে শব্দকে অদ্ভুত এক প্রকৌশলে বাজিয়ে এমন এক স্বচ্ছ ও সুরময় টংকার তৈরি করেন যা তার একান্তই নিজস্ব। তারা বলেছেন যে, জল ও জলপাই-এ চিরচেনা ক্ষুদ্র বস্তুর বিশাল বিস্তার যেমন আছে তেমনি আছে শিকড় শৈশব কাতরতা। আছে অবদমিত কামানুভবের সুতীব্র ছটফটানি, আছে নিজেকে ও নিজের চারপাশকে নিয়ে হা হা ছড়ানো তীক্ষ্ণ পরিহাস।'

সত্যি কথা। তবে পুরোটা নয়, শেষাংশটা। অর্থাৎ ৩৮টি পৃষ্ঠায় ছোট ছোট ৩৮টি কবিতায় অবদমিত কিছু কামানুভবের ছটফটানি আছে, আর নিজেকে ও নিজের চারিপাশ নিয়ে আছে সুক্ষ্ম কিছু পরিহাস। এর বেশি কিছু? হ্যাঁ তারও অতিরিক্ত আছে– একবারে নির্ভার, নিরলঙ্কার ঝকঝকে কবিতা-শরীর। তার ভাষাটা চকচকে কয়েনের মতো; সহজ ও প্রচল, মূল্যের অতিরিক্ত কিছু নেই, কিন্তু মূল্য কিছু আছে। যা লিখিত হয়েছে তার অর্থ বুঝতে সকলেই বাধ্য থাকিবে।

'চাবি যে কী করে তালার
আজন্ম কঠোর কাঠিন্যকে শিথিল করে ফেলে
তা আমি না বুঝেও বুঝি যে এদের
খাপে খাপে মিলে যাওয়াটাই ঘটনা
এই সামান্য ঘটনা ঘটার আগে
ক্যান যে এত খাটাখাটি লাগে।

(তালাচাবি)

আর সময়ের অন্যান্য অনেক তরুণ কবির মতো মামুনও মন্তব্য পরায়ণ। কবিতার শুরুতে কখনো, কখনোবা শেষে প্রাত্যহিক ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা দেখা-অদেখা কোনো দৃশ্য নিয়ে চমৎকার পরিহাসপ্রবণ মন্তব্য কিছু থাকে।

'আমাদের গা থেকে এক এক সব ক'টি আঁচিল

নিচ্ছ তুলে- দিচ্ছ বিশ্বজনীন মসৃণতা
আপাত মসৃণ এই ধৃত জীবনকেই আমরা
ভেবে নিচ্ছি উত্তরণ- উত্তর গমন।'

(উত্তর গমন)

আলোকাটা লেনে আঁধারের ধাঁধা

কবিতার ভাষার মধ্যে জাদু থাকে; বা বলা যায়, কবিতা মাত্রই জাদুবাস্তব। এই জাদুবাস্তবতার সাথে কেউ ইম্প্রেশনিস্ট অধিকল্পনা যুক্ত করেন, কেউ পরাবাস্তব স্তরের অবচেতনের অদ্ভূত কল্পনার মিশেল দেন।

যখন বলা হয়, 'ঢোলের চামড়া ফেটে বরিয়ে আসে লোমকূপের ক্রোধ/ আর সেই ক্রোধে নাচ করে গোলাকার চাকা।' তখন তা জাদুবাস্তব বৈকি; কিন্তু যখন বলা হয়, 'সেই সমস্ত অপরিণত মৃত্যু দাঁত মাজে, নাস্তা করে/ আর পোঁ পোঁ করে হেঁটে বেড়ায় তোমার স্বপ্নে / ... হাসিটা ঠিক উড়ে যাওয়া ওড়নার মতো'। তখন তা ইম্প্রেশনিস্ট না পরাবাস্তব? এমন ভাবনা বিপর্যয় হামেশাই ঘটবে নাভিল মানদার-এর 'আলোকাটা লেন'-এ। সেখানে বাস্তবের আলো নেই তেমন। আধা আলো। ধাঁধা আলো। কাটা আলো। বাঁকা আলো। ওখানে 'রাত আমাদের অন্যতম গ্রন্থ'। আর 'বটচারারা বটবৃক্ষ বোধে ধীরে ধীরে ফোলে ওঠে'। আর জেনুইন কিছু পাগল পোঁ পোঁ করে হেঁটে বেড়ায়।

সেলিম মোরশেদ বইয়ের ফ্ল্যাপে লিখেছেন, 'ভাষা ও ভাবনার বস্তুতে উন্নত চিন্তার ব্যাপ্তি দেখা যায়; কবিতার কথকতায় নতুন আঙ্গিক কাব্যসজীবতার পক্ষে থাকে'। কিন্তু বিশৃঙ্খল চিন্তার ব্যাপ্তি (যা পরাবাস্তবতার আবহ তৈরি করে) ছাড়া তো 'উন্নত চিন্তার' তেমন কোনো ব্যাপ্তি *আলোকাটা লেনে* আমাদের চোখে পড়ে না। সেলিম মোরশেদ প্রাজ্ঞজন, চিন্তার 'উন্নত রূপ' তাঁর কাছে সাধারণের চে' বেশিই ধরা দেয় হয়তো। আমরা যারা আম-পাঠক (আম-জনতা সদৃশ) তারা *আলোকাটা লেনে* অনভ্যস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। রঙিন আলোর ফোয়ারা দেখে আমরা মুগ্ধ হই, উপভোগ করি সপ্তরঙের সমাহারে আলোর বর্ণহীন স্বচ্ছতাকে।

নাভিল মানদার-এর কাব্যবোধে 'চাল থেকে মুড়ি হোয়ে একটা সন্ত্রাসী প্রজাপতি/ মুহূর্তে টোপকে গেলো জেলখানার পাঁচিল।' আর তার ম্যাচুরিটি এমন– 'কবরের মাটি স্তরে স্তরে রেকর্ড কোরে রাখে কান্নালিপি,/ হয়তো কোনো এক পাতাল পাঠক/ পাঠ কোরবে কান্নার প্রতিটি অক্ষর'।

গেলো বইমেলায় প্রতিশিল্প এর ব্যবস্থাপনায় ঢাকা থেকে বেরিয়েছে তরুণ কবি নাভিল মানদার এর প্রথম কবিতার সংকলন *আলোকাটা লেন*। প্রতিশিল্প গ্রুপের প্রতিনিধি নাভিল তার প্রথম বইয়ে বেশ বন্ধুপ্রীতির পরিচয় রেখেছেন। ৩৬টি কবিতার ১১টিই উৎসর্গ করেছেন সতীর্থ বন্ধু-বান্ধবদের। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর কল্পনার ইম্প্রেশন পেইন্ট করাকেই তিনি কাব্যনির্মাণ বুঝেছেন। কবিতার অপরাপর বিস্তৃতি ও ব্যাঞ্জনা *আলোকাটা লেনে* তেমন নেই। যেমন নেই দেশ-কাল-ঐতিহ্যের স্পষ্ট কোনো চিহ্ন। আধুনিকবাদী শিল্পতত্ত্ব যা সম্প্রতি নানা প্রশ্নে জর্জরিত সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় উপকরণ আহরণ করেছেন নাভিল তার কবিতা নির্মাণের কর্মশালায়।

শিল্পকলার প্রায় সব শাখায় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের যে আন্দোলন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, নাভিল মানদারের ভাবনায় তার কোন প্রতিফলন নেই। তবে স্বনির্মিত একটি কাব্য-আবহ, ভাষা বিন্যাসেও কিছুটা নিজস্বতাসহ *আলোকাটা লেন* কবিতার বইটি মনোযোগ দাবি করে। কবিতাকে যারা কল্পনার ফানুস ওড়ানো রঙিন বেলুনের মত দেখতে ভালোবাসেন তারা কবিতাগুলো উপভোগ করবেন দারুণভাবে।

নিগ্রো পরীর হাতে কামরাঙা কেমন সবুজ : জলরঙে সবুজের ছাপ

অভিজিৎ দাস নিজে তার এ বইটি প্রকাশের পর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, গ্রন্থের নাম শুনে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, পরী আবার নিগ্রো হয় নাকি? তাও সেই পরীর হাতে কিনা আবার কামরাঙা, কেনইবা সেই হাতে কামরাঙা এত গাঢ় সবুজের শিহরণ তুলবে! এতসব অনুন্মোচিত রহস্যের ধুম্রজালে তিনি মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সায় দেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অভিজিৎ মাথা নেড়ে বুঝাতে চান– পরীর নিগ্রো হওয়া, ডানার বদলে তার হাত এবং সেই হাতে কামরাঙা কেমন সবুজ হয়ে ওঠা– এসবের ম্যাজিক লুকিয়ে আছে কবিতায়। এহ্ তো কবিতাকল্প, তাই বিস্ময়ের কিছু নেই। বিষয়ের বৈপরিত্যকে যুগ্মতার বন্ধনে অভিনব ভাব সৃষ্টি করাই তো কবিতাকর্ম। দৃশ্যের আড়ালে যে অদৃশ্যের মায়া, ঘটনার ভিতরে নিহিত যে দ্বন্দ্ব তাকে রূপক-এ পরিণত করার দক্ষতাই কবিত্ব ।

তো, গ্রন্থটিতে সংকলিত কবিতাগুলোর জন্মলিপি, বিচ্ছিন্ন অনুভূতিমালার সামষ্টিক অবয়ব ও এর গঠন-প্রকৃতির বাইরেও যে অপ্রকাশ্য আবেগ, সংবেদন, বেদনা, আনন্দ, ক্রোধ, প্রতিশোধ প্রবণতা, অক্ষমতা, নিজের রুগ্নতার আড়ালে নিজেকেই লুকিয়ে রাখা, আত্মহন্তারক হবার বাসনা- এ সব কিছুকে লিপিবদ্ধ করার ভাষা তাঁর আছে কিনা এমন সংশয় প্রকাশের মাধ্যমে নিজের বিনয় প্রকাশ করেছেন অভিজিৎ। আমরা বরং তাঁর কবিতা পাঠ করে দেখতে পারি এর মধ্যে সেই সংবেদন, সেই অপ্রকাশ্য আবেগ, আত্মহন্তারক হবার সেই বাসনা ভাষা-চাতুর্যে ধরা পড়েছে কিনা। 'এ্যাম্বুলেন্স' নাম দিয়ে একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> 'আমাদের মাঝে কে আছে এমন
> একটি ব্যক্তিগত বেদনার নীল এ্যাম্বুলেন্স
> সাথে নেই যার!
> .....
> আমি আমার ব্যক্তিগত লাল এ্যাম্বুলেন্সের সাথে
> একবার লিপ্ত হতে চাই সহবাসে।'

এ্যাম্বুলেন্সের রূপকে অভিজিৎ মৃত্যুকে উপস্থিত করেছেন, সফলও হয়েছেন; লাল এ্যাম্বুলেন্সের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আত্মহন্তারক হবার বাসনা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

৪আজ আমার মৃত্যুদিন; সবার ঘরে একটি করে শ্মশান জ্বলুক!' কথা-বাক্য চমৎকার কাব্য, কিন্তু স্টাইলটি অভিজিৎ-এর নিজস্ব নয়। এ ধরনের মন্তব্য পরায়ণ, যুগ্মবৈপরিত্যের চমক তার সমসাময়িক অনেকের কবিতার প্রবণতা হয়ে ওঠেছে। বলার ভঙ্গির এই ছক থেকে নিজেদের

উদ্ধার করাই হবে, আমার মতে, তাদের কবিতার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটি সাহসের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা অভিজিৎ দাস-এর আছে বলে সাক্ষ্য দেয় তার এই প্রথম গ্রন্থটি। নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে যৌথতায় মিশিয়ে সময়ের ভাব-কল্পনাকে সময়হীনতায় উত্তীর্ণ করার কৌশল আয়ত্ব করা সাধনার বিষয় বৈকি।

'তোমাকে মাছ কাটতে দেখে
আমি পেলাম জলজন্ম;
সাঁতারের শব্দে জাগা স্রোতের পেখম

তুমি যদি ওভাবে আমার
মুন্ডুসমেত লেজ মুঠো করে ধরে
কখনো বটির মুখোমুখি হতে!
আমি না নড়তাম,
না চড়ে বেড়াতাম
অর্ধখণ্ড দেহে রেখে ভর।'
(মাছকাটা)

প্রেমের, আত্মসমর্পনের যে খণ্ডচিত্র, অর্ধখণ্ড দেহে ভর রেখে তার ভিতরে কামানুভাব ফুঁটে ওঠে পাঠক সংবেদনে তার অনুরণন জাগে তো। কবিতা হিসেবে তার সফলতা নিয়ে আর কী প্রশ্ন থাকে? তবু প্রশ্ন থেকে যায়– সে প্রশ্ন চিত্রকল্প নির্মাণের নয়, সে প্রশ্ন প্রকরণের। সাম্প্রতিকতার তরঙ্গে ভেসে নিজেকে আপ-টু-ডেট রাখা হলো ফ্যাশন, আর সময়কে ধারণ করে নিজের বলার মতো এবং চলার মতো ভঙ্গি নির্মাণ করা হচ্ছে স্টাইল। অভিজিৎ দাশ যেমন ফ্যাশনেবল তেমন স্টাইলিস্ট নন।